মানসিক রোগ

ও

কু-সংস্কার

AUTHOR

ডাঃ অলোকপাত্র

(Neuro Psychiatrist)

স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ

M.B.B.S. (Cal.) D.P.M (NIMHANS, Bangalore)
D.N.B. (New Delhi), F.I.P.S., M.I.M.A., F.I.A.P.P.

- Psychiatrist- in- Charge :
  Pranabananda Seva Sadan,
  Psychiatric Nursing Home.
- Ex-Resident :
  National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore.
  Central Institute of Psychiatry, Ranchi
- Ex-House Physician :
  Calcutta National Medical College & Hospital,
  Calcutta Pavlov Hospital (Gobra)
- Ex-Visiting Consultant.
  Antara. Baruipur

মানসিক রোগ ও কু-সংস্কার

ভূমিকা সাধারণ চিকিৎসকের কাছে যে সমস্ত রোগী আসেন তার চল্লিশ শতাংশই মানসিক রোগে ভোগেন। অথচ তারা মানসিক চিকিৎসকের কাছে আসতে চান না নিজেদের অজ্ঞতা, অসচেতনতা, কু-সংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার কারণে। অন্যদিকে মানসিক রোগের অধিকাংশই চিকিৎসার জন্য দ্বারস্থ হন ওঝা, গুনীন, মৌলবী, ভাগ্যবিশারদ, গ্রহরত্ন-জুরিবুটি-মাদুলী-তাবিজ বিক্রেতাদের কাছে। যারা মানসিক চিকিৎসকের কাছে আসেন তারাও চিকিৎসকের পরামর্শ সম্পূর্ণ রূপে অনুসরণ করেন না নিজেদের চিরাচারিত ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের কারণে। তাই সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মানসিক রোগ সম্পর্কিত কিছু কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার বিষয়ে আলোচনা করা হল এই প্রবন্ধে।

১। মানসিক রোগ মানেই পাগল নয় ঃ—

মানসিক রোগ মানেই পাগল নয়। মানসিক রোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় — সাইকোসিস (Psychosis) ও নিউরোসিস (Neurosis)। সাইকোসিস'কে পাগল বলা যায়, নিউরোসিস— শারীরিক অসুখের মতোই— যা কখনওই পাগল হিসাবে গণ্য হতে পারে না।

A সাইকোসিস ঃ— এই রোগের সাধারণ লক্ষণ

অস্বাভাবিক আচরণ করা, অসংলগ্ন কথা বলা, বেশী কথা বলা, নিজের মনে বিড়বিড় করা, অকারণে হাঁসা-কাঁদা, রেগে যাওয়া, মারধর, গালিগালাজ করা, রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা, অপরিস্কার থাকা, পোশাক না রাখা, সন্দেহ করা, ভয় পাওয়া ইত্যাদি।

B. নিউরোসিস ঃ— এই রোগের সাধারণ লক্ষণ

অবসাদ, বিষন্নতা, আশঙ্কা, উদ্বেগ, টেনশান, নার্ভাসনেস, শুচিবায়ুগ্রস্থতা, খিদে, ঘুম কমে যাওয়া, অস্থিরতা, মনসংযোগ কমে যাওয়া, যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, অহেতুক শারীরিক অসুখ নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকা, মদ-গাঁজা নেশা করা ইত্যাদি।

২। মানসিক রোগও শারীরিক রোগের মতোই একটি রোগ-রোগীর নিজের মনগড়া নয় ঃ—

নিউরোসিস গ্রুপের রোগে রোগী ছাড়া বাইরের কেউ কষ্টটা বুঝতে পারে না। সাধারণ চিকিৎসকও শারীরিক পরীক্ষা ও ইনভেসটিগেশনে কিছু না পেলে রোগীকে

বলে দেন তার কোন রোগ নেই। ফলে রোগীর বাড়ীর লোক ভাবে যে রোগী নিজে মনে করে বলেই তার রোগ হয়েছে বা সে রোগের ভান করছে ; অথবা সে চেষ্টা করলেই মন থেকে রোগ তাড়াতে পারে। আসলে কিন্তু তা নয়। নিউরোসিসও শারীরিক অসুখের মতোই একটি অসুখ। চিকিৎসা ছাড়া নিজের চেষ্টায় রোগ সারানো যায় না। স্নায়ু ও শরীরের যে সব পরিবর্তনের জন্য এ রোগ হয় তা সাধারণ পরীক্ষায় ধরা না পড়লেও মুখের বিবরণেই রোগের কারণ ধরা যায় এবং উপযুক্ত চিকিৎসায় তার নিরাময় করা যায়। রোগীর নিজের ইচ্ছায় যেমন এ রোগ আসে না, তেমনি রোগী ইচ্ছা করলেই রোগ তাড়াতে পারে না। চিকিৎসক বা বাড়ীর লোক না বুঝে রোগীর উপর চাপ সৃষ্টি করলে রোগ আরও বৃদ্ধি পায়।

মানসিক অসুখ সবই বংশগত বা হেরিডিটারী নয় ঃ—

কিছু মানসিক অসুখ বংশগত হলেও অধিকাংশই বংশগত নয়। কাজেই মানসিক রোগীর সন্তান সন্ততী মাত্রই যে মানসিক রোগে ভুগবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার যে পরিবারের কারুরই মানসিক অসুখ নেই তাদেরও মানসিক অসুখ হতে পারে।

মানসিক চাপ ছাড়াও মানসিক অসুখ হয় ঃ—

মানসিক চাপে মানসিক রোগ বেশী হলেও চাপ ছাড়াও মানসিক রোগ হয়। আসলে জেনেটিক, শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক নানান কারণের সমন্বয়এ মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। কাজেই এক লজিক (Logic) এ সমস্ত মানসিক রোগের কারণ ব্যাখ্যা করা যাবে না।

মানসিক রোগ ছোঁয়াচে নয় ঃ-

মানসিক রোগ ছোঁয়াচে নয়। রোগীর সাথে বসবাস করলে, এঁটো খেলে, লাথি খেলে রোগ ছড়ায় না।

পাগল কামড়ালে অন্যে পাগল হয় না ঃ-

পাগলের কামড় দিয়ে কোন রোগ ছড়ায় না। পাগলা কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক হয় বলে অনেকে এ রকম ভাবেন। পাগলের কামড়ে জলাতঙ্ক হয় না, পাগলামিও ছড়ায় না।

৭। মানসিক রোগ চিকিৎসায় সেরে যায় ঃ-

অধিকাংশ মানসিক রোগীই চিকিৎসায় পুরো সেরে যায়। তবে কিছু রোগের পুরো নিরাময় হয় না, রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় ।

৮। মানসিক রোগের ওষুধ সারাজীবন খেতে হয় না ঃ-

মানসিক-চিকিৎসার মেয়াদ জ্বল-জ্বালার চিকিৎসা থেকে একটু বেশী দীর্ঘ। অধিকাংশ রোগেই তিন থেকে ছমাস চিকিৎসায় সেরে যায়। এক তৃতীয়াংশ রোগীকে এক থেকে তিন বছর ওষুধ খেতে হয়। দশ শতাংশ রোগীকে অবশ্য বরাবর ওষুধ খেয়ে থাকতে হয়।

৯। মানসিক রোগের ওষুধ মাত্রই ঘুমের ওষুধ নয় ঃ-

এটি ভুল ধারণা। বেশ কিছু ওষুধে ঘুম হলেও অধিকাংশ ওষুধই ঘুমের ওষুধ নয়। শুধু ঘুমের ওষুধেও মানসিক রোগ সারে না। নূতন গ্রুপের ওষুধগুলোর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় পুরাতন ওষুধের মতো বেশী ঘুম হয় না।

১০। এই সব ওষুধে হার্টের ক্ষতি হয় না ঃ-

এইসব ওষুধে হার্টের কোন ক্ষতি হয় না। পরন্তু হার্টের রোগীদেরও টেনশন কমানোর জন্য কিছু সেডেটিভ ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

১১। এইসব ওষুধে নেশা হয় না ঃ-

বেনজোডাইয়াজেপিন গ্রুপের ওষুধে অ্যাডিকশান বা ডিপেনডেনস হলেও বাকী কোন ওষুধে এরকম হয় না। তাছাড়া নিয়ম মেনে বেনজোড়ায়াজেপিন দিলে ও বন্ধ করলে তাতে অ্যাডিকশন বা ডিপেনডেন্স হয় না।

১২। ভূতে ধরা ও মানসিক রোগ ঃ-

প্রচলিত বিশ্বাসে মানুষের শরীরে মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রবেশ করলে বা আকর্ষণ করলে সেই মানুষটি অস্বাভাবিক আচার-আচরণ করে। ব্যক্তি নিজের পরিচয় ভুলে প্রেতাত্মার পরিচয় দেয়- তার স্বরে কথা বলে। বাড়ীর লোকজন তার চুল টেনে রেখে নানান প্রশ্ন করেন- 'কেন এসেছিস ?

কি পেলে চলে যাবি ' ? ইত্যাদি। ওঝা-মৌলবী এসে মারধর করে, ঝাঁটা মারে,

জুতো পুড়িয়ে শোঁকায়। এই ভূতে ধরা বা ভূত ছাড়ানো একটি কুসংস্কার ও অমানবিক প্রথা । আধুনিক বিজ্ঞানে ভূতের কোন অস্তিত্ব নেই। 'ভূতে ধরা' একটি মানসিক রোগ। রোগীর মনে কোন মানসিকদ্বন্দ্ব (Psychological conflict) থাকলে তা এই রোগ রূপে প্রকাশ পায়। উদাহরণ স্বরূপ কোন মেয়ে নতুন শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে Adjust করতে না পারলে, কাজের চাপ সামলাতে না পারলে বা শ্বশুর বাড়ীর শাসনের প্রতিবাদ করতে না পারলে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এইভাবে সে তার সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। স্বামী বা বাপের বাড়ীর লোক পাশে দাঁড়ালে সম্যসার সমাধন হয়। ওঝা বা মৌলবীর হস্তক্ষেপের কোন ভূমিকা থাকে না। মানসিক চিকিৎসকের কাছে এলে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়। কোনরূপ শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহের শিকার হতে হয় না।

১৩। কালপুরুষ, জিন, হাওয়া-বাতাস ইত্যাদি ও মনোরোগ ঃ-

অনেক সময় মানসিক রোগী ভয় পায় যে কেউ যেন তাকে follow করছে, ভয় দেখাচ্ছে, মারতে আসছে ; ছায়ামূর্তি কিছু আসে পাশে ঘুরছে অথবা বলছে 'তোকে মেরে ফেলবো, কেটে ফেলবো' ইত্যাদি। যেহেতু বাড়ীর লোকজন আশেপাশে কিছুই দেখতে পায় না তাই তারা ধরে নেয় যে অশরীরি কিছু আত্মা আকর্ষণ করছে। আসলে এগুলি মনবিকারের লক্ষণ যেখানে কেউ না থাকলেও রোগী ভাবে কেউ তাকে মারতে আসছে। [যাকে বলে ডিলুইশন অফ পারসিকিউশন (Deiusion of Persecution)] অথবা চারপাশে কেউ না থাকলেও কানে কথা আসে [যাকে বলে হ্যালোসিনেশন (Hallucination)] । সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার কারণে এইসব অনুভবের ভৌতিক ও আদি ভৌতিক ব্যাখ্যা সহজেই বিশ্বাস্য হয়।

১৪। বাণ মারা, ওষুধ করা, যাদু মন্ত্র ও মানসিক রোগ ঃ-

কোন কিছু না ভালো লাগা, খিদে-ঘুম কমে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া, সন্দেহ ভয় হওয়া ইত্যাদি ডিপ্রেশান, অ্যাংজাইটি সাইকোসিস ও অন্যান্য নানান মানসিক রোগের লক্ষণ । সাধারণ মানুষ এইসব সমস্যার কারণ হিসাবে শারীরিক রোগ বা অন্য কিছু না পেলে কুসংস্কার হিসাবে বিশ্বাস করে যে কেউ বাণ মেরেছে, যাদু মন্ত্র করেছে বা জড়ি-বুটি খাইয়ে দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানে বাণ মারা বা যাদুমন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নেই। পাল্টা মন্ত্র প্রয়োগ, পেট থেকে ওষুধ তুললেও রোগের নিরাময় হয় না। একমাত্র মানসিক চিকিৎসাতেই এ রোগ সারে ।

১৫। ডাইনি প্রথা ও মানসিক রোগ ঃ-

বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অসুখের পর কিছু সম্প্রদায়ের মানুষ চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে গুণীনের কাছে যায়। গুণিন তাদের প্রতিবেশী বা আত্মীয়কে ডাইনি চিহ্নিত করে বলে যে, ঐ রোগী ডাইনের কোপে পড়েছে। তখন তারা দলবদ্ধভাবে ঐ "ডাইন"কে হত্যা করে। অশিক্ষা এবং কু-সংস্কারই ডাইনি প্রথার বিশ্বাসভূমি। বাস্তবে ডাইনি বলে কিছু নেই। ডাইনি মারলেও অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয় না, যতক্ষণ না তার চিকিৎসা করা হয়।

১৬। মৃগী রোগ ও কু-সংস্কার ঃ-

মৃগী একটি নিউরোলোজিক্যাল ডিস্‌অর্ডার। ব্রেনের কিছু কোষের অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ নিঃসরণের কারণে এই রোগ হয়। আধুনিক চিকিৎসায় এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। অনেকে এই রোগকে ঈশ্বরের অভিশাপ, পূর্বজন্মের পাপের ফল ভাবে। কেউ কেউ ভাবে শরীরের অশুভ আত্মার প্রবেশ ঘটলে এ রোগ হয়। লোকে ঝাড়-ফুঁক করে, ঠাকুর থানে জল খাওয়ায়, তাবিজ, মাদুলি, জড়িবুটির সাহায্যে রোগ সারানোর চেষ্টা করে। এসবে রোগতো কমেই না বরং বাড়ে। মৃগী রোগ ছোঁয়াচে নয়। মৃগী রোগীর এঁটো খেলে বা লাথি খেলে এরোগ সংক্রামিত হয় না। "মৃগীর খিঁচুনি চলাকালীন লোহা ছোঁয়ালে খিঁচুনি বন্ধ হয় ; মৃগী কখনো সারে না, মৃগী রোগী স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারে না"—এ সবই ভ্রান্ত ধারণা।

১৭। অলৌকিক শক্তি ও মানসিক রোগ ঃ-

মানসিক রোগে অনেক সময় রোগীর প্যারালাইসিস হয়, কথা বন্ধ হয়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি হারিয়ে যায়। এই সবের কোন শারীরিক বা স্নায়বিক Deficit থাকে না। সাধারণতঃ মানসিক দ্বন্দ্ব, অবসাদ, উদ্বেগ থেকেই এই রোগের সূত্রপাত হয়। মানসিক সমস্যা ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে, সাইকোথেরাপি ও ঔষধ প্রয়োগে এই রোগের চটজলদি নিরাময় করা যায়। একই সমস্যা নিয়ে দেবতার স্থানে গেলেও বিশ্বাসের কারণে মিরাকুলাস ফল পাওয়া যায়। বিশ্বাসই এখানে নিরাময়ের কারণ, দৈব শক্তি বা অলৌকিক শক্তির কোন ভূমিকা নেই।

১৮। হিস্টিরিয়া ও মৃগী এক রোগ নয় ঃ-

হিস্টিরিয়া ও মৃগী এক রোগ নয়। মৃগী একটি নিউরোলজিক্যাল ডিস অর্ডার। হিস্টিরিয়া মানসিক রোগ। হিস্টিরিয়ায় মৃগীর মতো খিঁচুনী হলেও মৃগীর সাথে তার কিছু সুক্ষ্ম তফাৎ থাকে— যা বিশেষজ্ঞরা সহজেই ধরতে পারেন। মানসিক দ্বন্দ্ব থেকেই হিস্টিরিয়ার উৎপত্তি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যেমন কোন ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসে। সেই মেয়েটির অন্য কোথাও বিয়ে হচ্ছে। ছেলেটি সেটা মেনে নিতে পারছে না। তখন সে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। Councllling ও Crisis intervention থেরাপির মাধ্যমে তার মানসিক কষ্ট কমালে রোগের নিরাময় হয়।

১৯। ধাতুক্ষয় ও মানসিক রোগ ঃ-

আমাদের সমাজের একটি বদ্ধমুল ভ্রান্ত ধারণা যে ধাতু শরীরের মূল্যবান অংশ। একফোঁটা ধাতু মানে চল্লিশফোঁটা রক্ত। একফোঁটা রক্ত মানে চল্লিশ ফোঁটা রক্ত মজ্জা। কাজেই ধাতু শরীর থেকে বের হলে শরীরের রক্ত মজ্জা সব বেরিয়ে শরীর শুকিয়ে যায়। এটি একেবারেই অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক ধারণা। ধাতু সন্তান উৎপাদন ছাড়া অন্য কাজে লাগে না। ধাতু তৈরীতেও শরীরের বিশেষ কোন পুষ্টি লাগে না। ধাতু নিঃসরণ কম বা বেশী করা ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভ্যাস যার শারীরিক প্রভাব খুবই গৌণ। অল্প বয়সের হস্ত মৈথুন বা অতিরিক্ত সঙ্গমের জন্য অনেকে অপরাধ বোধে ভোগেন। ভয়, উদ্বেগে শারীরিক ও মানসিকবাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। ঘুম, ক্ষিদে ও ওজন কমে যায়। ব্যক্তি ডিপ্রেসান, এনজাইটি, পুরুষত্বহীনতা, শীঘ্রপতন, যৌণক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি নানান রোগের শিকার হয়। ধাতুক্ষয় নয়, ধাতুক্ষয়জনিত ভ্রান্তধারণাই এইসব রোগের কারণ।

২০। মস্তিষ্কে আঘাত ও স্মৃতিলোপ ঃ-

মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে অনেক সময় স্মৃতি লোপ পায়। আঘাত লাগাল পরের কিছু সময় বা কিছু দিনের স্মৃতি লোপ পাওয়াকে ANTEGRADE AMNESIA বলে। আঘাতের কিছু সময় বা কিছুদিন আগের স্মৃতি লোপ পাওয়াকে RETROGRADE AMNESIA বলে। অনেক ক্ষেত্রে একই সাথে ANTEGRADE ও RETROGRADE AMNESIA দুটোই ঘটে থাকে। এই AMNESIA র সাথে PSYCHOGENIC AMNESIA র তফাৎ অনেক। PSYCHOGENIC AMNESIA সাধারণতঃ কোন বিশেষ ঘটনা বা

বিশেষ ব্যক্তির কথা রোগী ভুলে যায়। বাকি সবকিছু মনে থাকে। যেমন কেউ তার বাবার মৃত্যুর পর এই মৃত্যুর ঘটনা ভুলে যায়। অথচ বাকী সমস্ত স্মৃতি ঠিক থাকে। মানসিক চাপ কমে গেলে এই স্মৃতি ফিরে আসে। কিন্তু নিউরোলজিক্যাল অ্যামনেসিয়ায় সব সময় স্মৃতি ফেরানো যায় না। সিনেমায় যেমন দেখায় আবার দ্বিতীয়বার মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে লোপ পাওয়া স্মৃতি ফিরে আসে বাস্তবে তা কখনও সম্ভব নয়। দ্বিতীয়বার আঘাতে আরও বেশী স্মৃতি লোপ পাওয়ার সম্ভবনা থাকে। তবে সাইকোজেনিক অ্যামনেসিয়ায় অনেক সময় ব্যক্তি তার নিজের পরিচয় ও অতীত স্মৃতি ভুলে গিয়ে দূরবর্তী কোন স্থানে নতুন পরিচয় নিয়ে বসবাস করে- বেশ কিছুকাল পরে আবার আগের পরিচয়ের স্মৃতি নিয়ে ফিরে আসে। কেউ কেউ এই সময় আবার মাঝের স্মৃতিটা হারিয়ে ফেলে।

২১। বিছানায় প্রস্রাব করা একটি মানসিক রোগ ঃ-

পাঁচ বছর বয়সের পরেও রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করাকে Nocturnal Enuresis বলে। এটি একটি মানসিক রোগ যা চিকিৎসায় সেরে যায়। কিন্তু অনেকেই এটাকে রোগ বলে না জেনে ফেলে রাখে- বা ঠাকুরথানের ঝাঁটা খাওয়ায়। তবে মৃগী, প্রস্রাবের নালীর ইনফেকশান, কৃমি বা স্পাইনাল কর্ড ডিজিজেও Enuresis হয়।

২২। তোতলানো (STUTTERING) একটি মানসিক রোগ ঃ-

তোতলানোকে অনেকে জন্মগত দোষ বা মুখের গঠনগত ত্রুটি (যেমন আলজিভ ছোট) বলে ভাবে। কথা বলতে বলতে আটকে যায়— কোন একটি অক্ষর প্রলম্বিত হওয়া বিশেষ কোন অক্ষর উচ্চারণে অসুবিধা হওয়া বা ভুল উচ্চারণ করা, অপরিচিতর সামনে, একাধিক লোকের সামনে, ক্লাসে কথা আটকে যাওয়া বা আদৌ বলতে না পারা সবই স্টাটারিং-র লক্ষণ। মানসিক চিকিৎসায় ঔষধ ও কিছু টেকনিকের প্রয়োগে রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

২৩। সাইকোসোমাটিক ডিস অর্ডার— লক্ষণ শারীরিক, রোগ মানসিক ঃ-

কিছু কিছু অসুখ আছে যার প্রকাশ ও লক্ষণ শারীরিক কিন্তু কারণ মানসিক। যেমন অ্যাসিড পেপটিক ডিস অর্ডার, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম, অ্যাজমা, ডাইরিয়া, কোষ্টবধ্যতা ইত্যাদি, এইসব কষ্টের সাধারণ চিকিৎসায় উপসম হয় না। ইনভেসটিগেশনে কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ মানসিক চাপ ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটির কারণেই এই রোগ হয়। রোগী বা তার বাড়ীর লোক এটিকে মানসিক রোগ বলে মেনে নিতে পারে না। বারবার ফিজিশিয়ান এর কাছে যায়, বারবার

ইনভেস্টিগেশন করায় অথচ কোন উপকার পায় না। দুর্ভোগময় জীবনযাপন করে। দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে মানসিক চিকিৎসকের দ্বারস্থ হলে সহজে নিরাময় লাভ করা যায়।

২৪। বিবাহ ও মানসিক রোগ ঃ-

বিয়ে দিলে মানসিক রোগ সেরে যায় ই ভ্রান্ত ধারণায় অনেকেই অসুস্থ ব্যক্তির বিয়ে দেন। তাতে রোগ কমে না বরং বিয়ের পর দায়িত্ব ও চাপ বেড়ে যাওয়ায় রোগ আরও বেড়ে যায়। অনেক সময় অসুস্থ ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী ছেড়ে চলে যায়। ডির্ভোস বা ছাড়কাট হয়ে যায় তাতে রোগীর মানসিক চাপ বাড়ে, ফলত রোগ বেড়ে যায়। মানসিক রোগী অবশ্যই বিয়ে করতে পারে তবে সুস্থ থাকাকালিন। উল্টোদিকে অতীতে মানসিক রোগ হয়েছিল এমন জানলে অনেকে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেয় যা কখনই কাম্য নয়। সুস্থ অবস্থায় মানসিক রোগীর বিয়েতে কোন বাধা নেই।

২৫। প্রেগনেন্সি ও মানসিক রোগ ঃ-

মেয়েদের পেটে বাচ্চা এলে বা মা হলে মানসিক রোগ সেরে যায় এই ধারণায় অনেকে অসুস্থ অবস্থায় মেয়েদের গর্ভধারণের পরামর্শ দেয়। এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা যা সমস্যা বাড়ায়— কমায় না। অসুস্থ অবস্থায় গর্ভধারণ করলে রোগী যেসব ওষুধ নেয় তার প্রভাব গর্ভস্থ ভ্রূণের উপর পড়ে। তাছাড়া অসুস্থ ব্যক্তি নিজের বা বাচ্চার দেখাশোনা ঠিকমতো করতে পারে না। কিছু কিছু মানসিক অসুখ আছে যেমন ECLAMPSIA, POST PARTUM PSYCHOSIS ইত্যাদি অসুখ প্রেগনেন্সি ও ডেলিভারীর সময়েই হয়। কাজেই ডাক্তারে পরামর্শ বিনা অসুস্থ রোগীর গর্ভধারণ করা বিপজ্জনক হতে পারে।তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সুস্থ থাকাকালীন মানসিক রোগীও গর্ভধারণ করতে পারে ।

২৬। উচ্চশিক্ষা, চাকরী ও মনোরোগ ঃ-

উচ্চশিক্ষা, চাকরীর ক্ষেত্রে অনেকের মনোরোগ বা চিকিৎসার কথা গোপন রাখতে চায়— কারণ এমনটা জানাজানি হলে শিক্ষা বা চাকরী থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হতে পারে বলে অনুমান করে। এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। শারীরিক অসুখের মতই মানসিক অসুখ শিক্ষা বা চাকরীর ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক নয়। কেবল অসুস্থতা থাকাকালীন বিশ্রামে থাকতে হয়, সুস্থ হলে আবার পড়াশুনা বা কাজে যোগ দিতে পারে ।

২৭। মনোরোগ ও বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ-

অনেকের ধারণা বিয়ের আগে বা বিয়ের পরে স্বামী বা স্ত্রীর কোন মানসিক রোগ হলে অন্য পক্ষ ডিভোর্স বা বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারে। এটি ভ্রান্ত ধারণা। শারীরিক অসুখের মতই মানসিক অসুখ হলে রুগীর স্বামী বা স্ত্রীর দায়িত্ব হল তাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলা। বিবাহ বিচ্ছেদের ভাবনায় অবহেলা করে রোগ জটিল করা উচিত নয়। একমাত্র Servere Mental Illness হলে এবং তা চিকিৎসায় আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা না থাকলে এবং ব্যক্তি আদৌ দাম্পত্য বা সাংসারিক জীবন যাপন করতে না পারলে তবেই বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্ন উঠতে পারে এবং তাও দীর্ঘ চিকিৎসা ও আইনী প্রক্রিয়ার পর।

২৮। আত্মহত্যা ও মনোরোগ ঃ-

আত্মহত্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনোরোগের পরিণতি । বিষন্নতা বা অবসাদ রোগ, স্কিজোফ্রেনিয়া, প্যারানোয়েড সাইকোসিস বা সন্দেহ প্রবণতা, মদ ও অন্যান্য নেশার শিকার গ্রস্থতা, ব্যক্তিত্বের বিকার ইত্যাদি অধিকাংশ আত্মহত্যার কারণ। বেকারত্ব, অর্থাভাব, সাংসারিক বা সামাজিক সমস্যা থেকেও যে সব আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে তাদেরও অধিকাংশই ডিপ্রেসন, অ্যাংজাইটিতে দীর্ঘদিন ভোগার পরে এমন পদক্ষেপ নেয়। কাজেই আত্মহত্যা প্রতিরোধ করতে হলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত ।

২৯। ইচ্ছাকৃত স্ব-ক্ষতি ও মনোরোগ ঃ-

ঝগড়াঝাটির পর, ব্যর্থতার পর অনেকে ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যার চেষ্টা করে বিষ খায়, গলায় দড়ি দেয়, ব্লেড দিয়ে হাত কাটে, গায়ে আগুন লাগায় । অনেকে ছোট খাট upset বিষয়ে হলেই এরকম করে এবং বার বার একই কাজ করতে থাকে। এসবই মানসিক রোগের বহিঃপ্রকাশ চিকিৎসা করলে সুস্থ হয়ে যায় এবং বড় ধরণের বিপদ এড়ানো যায়।

৩০) শুচিবায়ু গ্রস্থতা ও মনোরোগ ঃ-

বারবার ধোয়াধুয়ি, মোছামুছি করা, অতিরিক্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, অতিরিক্ত শকড়ি এঁঠো বিচার ; পায়খানা, পেচ্ছাব, নোংরা ছোঁয়াছুয়ি এড়ানো, বারবার স্নান করা, কাচাকাচি করা, বারবার একই কাজ পরীক্ষা করা, বারবার একই জিনিস গুণতে থাকা ইত্যাদিকে অনেকে অভ্যাস দোষ বা ম্যানিয়া বলে— রোগ বলে ভাবে না।

কিন্তু এসবই একটি মনসিক রোগ-অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার (Obscessive Compulsive Disorder) যা চিকিৎসা করলে সেরে যায়।

৩১) সাদা স্রাব (লিউকোরিয়া) ও মনোরোগ ঃ-

সাদাস্রাব জোনীর স্বাভাবিকস্রাব। এটা কোন রোগ নয়। এটা অতিরিক্ত হলে অনেকে মনে করে লিউকোরিয়ার জন্যই স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে- যদিও আসল সত্যটা তার উল্টো অর্থাৎ স্বাস্থ্য খারাপ হলে স্রাব বেশি হয়। অনেকে অবসাদ, বিসন্নতা, এ্যাংজাইটি ও নানান মানসিক অসুখে ভোগে এবং এই সব রোগকে সঠিক ভাবে চিনতে না পেরে ভাবে যে সাদাস্রাবের কারণেই শরীর মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই হজার হাজার টাকা খরচ করে সাদা স্রাবের চিকিৎসার জন্য- বাজারী বিজ্ঞাপন দেখে ঔষধ কেনে, গাছ গাছড়ার ঔষধ, এমন কি কিছু হাতুড়ের কারসাজিতে বিদেশী ঔষধ, দৈব ঔষধ বলেও প্রচুর দামী দামী ঔষধ ব্যবহার করে। বয়ঃসন্ধির পর, মাসিক হওয়ার দুই তিন দিন আগে ওভিউলেশনের সময় (মাসিকের ১৪ দিনের মাথায়), গর্ভাবস্থায়, প্রসবের পর সাদা স্রাব বেশি হয় এবং তার কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। যোনীতে Fungal বা Bacterial infection হলে, টি. বি. হলে, কুচোকমি হলে ডায়াবেটিস হলে, প্রজনন অঙ্গের টিউমার হলে সাদা স্রাব হয় এবং তা আধুনিক চিকিৎসায় খুব সহজেই নিরাময় করা যায়। অপরিচ্ছন্নতা, অপুষ্টিতে সাদাস্রাব বেশি হয়। আর নানান মানসিক রোগেও সাদাস্রাব বেশি হয় এবং সেক্ষেত্রে চিকিৎসা মানসিক রোগের করতে হয়- সাদাস্রাবের নয়।

৩২। চিন্তা রোগেরও ওষুধ আছে ঃ-

অতিরিক্ত চিন্তা হওয়া, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়াও একটি রোগ। এবং তা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কিছু নিউরোকেমিক্যাল (Neuro Chemical) ত্রুটির কারণে হয়। ফলে সাধারণ সমস্যায় অন্যরা যেমন স্বচ্ছন্দে থাকে depression বা অবসন্নতা রোগের ভুক্তভোগীরা তেমন থাকতে পারে না। দুঃশ্চিন্তা উদ্বেগে থেকে শত চেষ্টা করেও মুক্ত হতে পারে না। একমাত্র ঔষধ এবং বিশেষজ্ঞের বিভিন্ন প্রকার Counseling ও Therapy -এর সাহায্যেই চিন্তার কবল থেকে মুক্ত হয়।

৩৩। মাথার মধ্যে পোকা ঃ-

কিছু ব্যক্তির ধারণা হয় যে তার মাথার মধ্যে পোকা হয়েছে। কান দিয়ে কেন্নো বা কোন পোকা মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়ে বাসা বেঁধেছে, ব্রেন কুরে কুরে খাচ্ছে হাজার

হাজার বাচ্চা দিয়েছে— তারা মাথার ভেতর চরে বেরাচ্ছে। ফলে অসম্ভব মাথার কষ্ট হচ্ছে। এটি একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। যাকে বলা হয় Delusion of Zoopathy । এটি একটি মানসিক রোগ। চিকিৎসা করলে মন থেকে ধারণাটা দূর হয়। কান দিয়ে কোন কিছু মাথার ভিতর প্রবেশ করতে পারে না।

৩৪। পাগলের সর্দি হয় না এটা ভ্রান্ত ধারণা ঃ-

বদ্ধ পাগলের সহজে ঠাণ্ডা লাগে না বা সর্দি কফ হয় না তা তারা দীর্ঘদিন রোদে জলে পড়ে থাকে বলে। কিন্তু তাই বলে সমস্ত মানসিক ভারসাম্যহীনদের সর্দি কফ হয় না তা নয়। অনেকের ধারণা সর্দি কফ হলে মাথাহাল্কা হয় এবং সর্দি কফ না হলে তা মাথায় জমে মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। এই ভ্রান্ত ধারণায় অনেকেই মানসিক রোগীর মাথায় অতিরিক্ত জল ঢালে, বরফ দেয়। এতে রোগতো কমেই না বরং সাইনোসাইটিস, রেসপিরেটারি ট্রাক্ট ইনফেকশান ইত্যাদি হয়।

৩৫। স্মৃতি বর্ধক ওষুধ ও মনোরোগ ঃ-

বাজারী বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে অনেকে স্মৃতি শক্তি বাড়ানোর জন্য গাছগাছড়ার ওষধি বা ব্রেনের টনিক খায়। এতে স্মৃতি শক্তিতো বাড়ে না বরং ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় নানান রকমের মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়।

৩৬। যৌন ক্ষমতা বর্ধক ওষুধ ও মনোরোগ ঃ-

বাজারী বিজ্ঞাপন দেখে অনেকে যৌন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দামী দামী গাছ গাছালির ওষুধ বা বিদেশী ওষুধ খায়। এতে যৌন ক্ষমতা তো বাড়েই না বরং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অনেকে অসুস্থ হয়। এই সব ঔষুধের মধ্যে গোপনে স্টেরোয়েড গ্রুপের ওষুধ দেওয়া হয়। যাতে শরীরে হাজার অসুখের সৃষ্টি হয়। বাসে ট্রেনে যারা এসব ওষুধ বিক্রি করে তারা অকারণ ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করে-অবাস্তব যৌন ক্ষমতার মোহ দেখায়- ফলতঃ স্বাভাবিক যৌন ক্ষমতা আরও হ্রাস পায়। অগাধ অর্থ ব্যয়ে মানসিক বিপর্যয়ের ফলেও যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়। যৌন ইচ্ছা কম হওয়া লিঙ্গ শিথিলতা, শীঘ্রপতন, সাদাস্রাব ইত্যাদি বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক রোগের লক্ষণ- বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছেই তার সঠিক চিকিৎসা হয়।

৩৭। স্বাস্থ্য বর্ধক, বডি বিল্ডিং, ওষুধ ও মনোরোগ ঃ-

ওজন বাড়ানোর জন্য অনেকে হাতুড়ের পরামর্শে ডেকাড্রন ও প্রাকটিন গ্রুপের

ওষুধ খায় । এতে সাময়িক ওজন বৃদ্ধি হলেও ওষুধ বন্ধ করলেই ওজন হ্রাস পায়। সঙ্গে দীর্ঘদিন এইসব ওষুধ ব্যবহারের কারণে নানা রকমের শরীরিক অসুখ হয় ও স্বাস্থ্য হানি হয়। বডি বিল্ডিং এর জন্য আয়ুর্বেদিক ওষুধ বলে গোপনে স্টেরোয়েড ব্যবহার করা হয় যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার অনেক শারীরিক অসুখের সৃষ্টি হয়। অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারায়। সুস্বাস্থ্যের জন্য রোগ মুক্ত শরীর, সুষম খাদ্য ও কিছু স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হয়। সহজে স্বাস্থ্য বাড়াতে গেলে ফল বিপরীত হয়।

৩৮। গোপনে মদ ছাড়ানো ঃ-

গোপনে মদ ছাড়ানোর জন্য রোগীকে না জানিয়ে তাকে যে ওষুধ খাওয়ানো হয় (Disulfiram Gr.) সে ওষুধ খাওয়ার পর রোগী মদ খেলে নানা রকম শারীরিক কষ্টের শিকার হয়। তাতে ভয় পেয়ে কেউ মদ ছাড়লেও অধিকাংশই মদ খাওয়া চালিয়ে যায় । মদ ও ওষুধের Interaction এ অনেক B. P. কমে যায়- ডিহাইড্রেশান হয় Emergency চিকিৎসা না করালে রোগী মারাও যায়। তা ছাড়া দীর্ঘ দিন এসব ওষুধ প্রয়োগে নানারকম শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়। মদ ছাড়াতে হলে রোগীকে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মদের কু-প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন করে নেশা ছাড়াতে Motivated করে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে মদ ছাড়ানো হয়। অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বাড়ীর লোক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারস্থ হলে সঠিক পন্থার হদিশ পায়।

৩৯। ডাক্তার যখন বলেন কোন রোগ নাই ঃ-

অনেক সময় রোগী নানান শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট নিয়ে ডাক্তারের কাছে যান- ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন যে রোগীর কোন রোগ নাই- তখন রোগীর কষ্ট আরও বেড়ে যায়- রোগী হতাশ হয়ে পড়ে বাড়ির লোকজন রোগীর প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে উল্টে দোষারোপ করে- যাতে রোগীর, কষ্ট আরো বেড়ে যায়। আসলে যে কোন ধরণের শারীরিক বা মানসিক কষ্টই রোগ। অনেক সময় চিকিৎসক তার অজ্ঞতার কারণে রোগ ধরতে পারেন না বা মানসিক রোগকে রোগ বলে মানতে চান না। তাই বলে দেন কোন রোগ নাই। এসব ক্ষেত্রে তাদের উচিত কোন স্পেশালিষ্ট বা সাইকেট্রিস্টের কাছে রেফার করা। রোগী বা বাড়ীর লোকের উচিত অভিজ্ঞ ও মনরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া যাতে সুচিকিৎসা পাওয়া যায়- তা না হলে রোগ আরো জটিল হয়।

৪০। ইনভেসটিগেশান যখন নেগেটিভ হয় ঃ-

অনেক সময় রোগীর হার্টের কষ্ট অথচ ECG, ECHO, TMT নর্মাল হয়; গ্যাসট্রিক প্রোবলেম হয় অথচ USG, Endo Scopy নর্মাল হয় ; ব্রেনের অসুখে CT Scan, MRI, EEG নর্মাল হয়। এসব ক্ষেত্রে রোগী বা বাড়ীর লোকজন ভাবেন রিপোর্ট যখন নেগেটিভ তখন আসলে কোন রোগ নাই। আসলে সাইকোসোমাটিক বা সাইকিয়াট্রিক রোগের ক্ষেত্রে যে শারীরিক ত্রুটি থাকে তা খুবই আনুবিক্ষণীক। তাই সাধারণ ইনভেসটিগেশানে সেগুলি ধরা পড়ে না। অত্যাধুনিক ইনভেসটিগেশান- (যা এদেশে এখনও আসেনি।) এ কিছু কিছু হয়ত ধরা পড়ে, বাকী সব হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নত ইনভেসটিগেশানে ধরা পড়বে। কাজেই বর্তমানে শুধুমাত্র রোগের লক্ষণ বিশ্লেষণ করেই রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়। ইনভেসটিগেশান নেগেটিভ হলেই রোগ নাই বা রোগ ধরা পড়েনি ভেবে হতাশ হওয়া ঠিক নয় ।

৪১। কম্পিউটারে রোগ নির্ণয় ঃ-

অনেক চিকিৎসক কম্পিউটারে রোগ নির্ণয়ের নামে USG মেসিন নিয়ে রোগীদের প্রতারণা করেন। USG মেসিন দিয়ে কেবলমাত্র পেটের কিছু রোগ ধরা যায়। মাথা বা হাত পায়ের কোন রোগ এই মেসিনে ধরা পড়ে না। চোখের পাওয়ার টেষ্ট করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। হার্টের জন্য ECHO Cardiography করা হয় তার মেসিনও USG মেসিন থেকে আলাদা। CT Scan বা MRI এর জন্য যে মেসিন ব্যবহার করা হয় তাও USG মেসিন থেকে আলাদা। কাজেই কম্পিউটারের সাহায্যে সারা শরীরের রোগ নির্ণয়ের নামে প্রতারিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৪২। প্রেমের অভিনয় করে রোগ সারানো ঃ-

অনেকের ধারণা প্রেমে কেউ ব্যর্থ হলে বা আঘাত পেয়ে মানসিক রোগের শিকার হলে ডাক্তা বা নার্সরোগীর সাথে প্রেমের অইভনয় করে তাকে সারিয়ে তোলেন। এই ভ্রান্ত ধারণার পিছনে বিভিন্ন সিনেমার প্রভাব কাজ করে । সিনেমার অবাস্তব গল্পে এমনই দেখানো হয়। বাস্তবে কিন্তু এমন কোন চিকিৎসা পদ্ধতি নাই। সাই-কোথেরাপি বা কাউনসেলিং এর সময় চিকিৎসক বন্ধু, শিক্ষক বা শুভাকাঙ্খীর মতো আচরণ করেন কখনই প্রেম, অভিনয় বা প্রেমের অভিনয় করেন না।

৪৩) ডিম, মাছ, মাংস খেলে মানসিক রোগ বেশি হয় না ঃ-

প্রোটিন জাতীয় খাওয়ারকে সাধারণ লোক উত্তেজক খাবার ভাবে এবং মনে করে এই সব খাবার খেলে শরীরে উত্তেজনা বেশী হয় এবং মানসিক রোগ বেশী হয়। ফলে মানসিক রোগীদের এসব খাবার বন্ধ করে দেয়। এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত বরং আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষই প্রোটিন জাতীয় খাবার খুব কম পরিমাণে খায় । তাই অসুস্থ রোগীদের আরও বেশী পরিমাণে এই ধরণের খাবার খাওয়া উচিত । তবে কারো ক্লোরেস্টেরল বেশি থাকলে ডিমের কুসুম বা ফ্যাটি মাছ খাওয়া নিষেধ ।

৪৪) মানসিক রোগ না বদমায়েসী ঃ-

অনেক সময় কোন রোগী অস্বাভাবিক আচরণ করলে বাড়ীর লোকেরা এটা রোগ না রোগীর ইচ্ছাকৃত আচরণ বুঝতে পারে না। ভয় দেখালে বা শাসন করলে অস্বাভাবিকতা কমলে লোকে ভাবে এটা বদমায়েসী। জ্ঞানের কথা বললে বা সময় সময় ভালো আচরণ করলে লোকে ভাবে ও 'সেয়ানা পাগল'। অনেকে তাই চিকিৎসা না করিয়ে মরধর, অত্যাচার বাড়িয়ে দেয় রোগীকে সুস্থ করার জন্য। এতে রোগ আও জটিল হয়। কিছু লোক 'মানসিক ভারসাম্যহীন বা পাগল' বলতে বোঝেন যারা লোক চিনতে পারে না, পয়সা গুণতে পারে না, অতীতের কথা বলতে পারে না— তারাই। আসলে তারা Severe mental illness এ যারা ভোগে তাদেরকেই মানসিক রোগী ভাবেন— Mild বা modarate mental illness detect করতে পারেন না। ফলে চিকিৎসা করাতে আগ্রহী হন না ।

৪৫। ECT (Elctro Convulsive Theraphy) :-

মানসিক রোগ চিকিৎসার বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসার মধ্যে ECT একটি অন্যতম পদ্ধতি- যা ওষুধের সাথে সঠিক ব্যবহারে রোগ নিরাময় দ্রুত হয়। কিন্তু অনেকেই নিজেকে বা বাড়ীর লোককে ECT দিতে রাজি হয় না। কার কারণ বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ও ভীতি । অনেকে ভাবেন ECT তে রোগীর প্রচন্ড শারীরিক কষ্ট হয় কিন্তু বাস্তবে তা নয়। Current shock সিনেমায় যেমন দেখানো হয় অত্যাচারে বা চিকিৎসায় ECT তেমন নয়। এতে 120 Volt Current দেওয়া হয় এবং তা খুবই স্বল্প সময়ের। রোগীর সামান্য খিচুনী হয় এবং রোগী জ্ঞান ফেরার পর ঐ খিঁচুনীর কথা বিস্মৃত হয়ে যায় । ECT দিলে ভবিষ্যতে ব্রেন অকেজো হয়ে

যায়— এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা । ECT একবার দিলে পরে আর অন্য ওষুধ কাজ করে না— এটাও ভ্রান্ত ধারণা । কিছু ক্ষেত্রে ECT —জীবনদায়ী- তাই ডাক্তার পরামর্শ দিলে তা গ্রহণে দ্বিধা করা উচিত নয় ।

৪৬। আংটি, মাদুলি, তাবিজ ও মনোচিকিৎসা ঃ-

শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক, কর্মজাগতিক বা সামাজিক নানান সমস্যা থেকে মুক্তি খুঁজতে অনেকে জ্যোতিষী বা ভাগ্যবিশারদের দ্বারস্থ হন এবং আংটি, মাদুলি, তাবিজ ইত্যাদি ধারণ করেন। এগুলি কেবলমাত্র ভরসা যোগায়, সাহস যোগায় ও আশার সন্ধান করে যা হতোদ্যম ব্যক্তিকে কিছু ক্ষেত্রে সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে— কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারে না। কারণ সামগ্রিক ভাবে সমস্যা কাটানোর জন্য রুগীর প্রয়োজন হয় Councelling, Psychotherapy- র যা আলোচনা পরামর্শের মাধ্যমে রোগীর নিজের Coping Skill বাড়িয়ে তুলে, তার চিন্তা ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে (যাকে Cognitive Therapy বলে), ব্যবহারিক জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়ে (যাকে Beheviour Therapy বলে), আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে (যাকে Psychodynamic Therapy বলে) সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। মাদুলি, তাবিজ মানসিক সান্ত্বনা দেয়।

—আত্মনির্ভরতা কমায়, নিজের কর্মফলের পরিবর্তে ভাগ্যনির্ভর করায় যা রোগীকে ভবিষ্যতে বড় সমস্যার মোকাবিলা করার পারঙ্গম করে না।

৪৭। বাস্তবিদ্যা ও মনোরোগ ঃ-

অনেকে তার জীবনের নানা। সমস্যার কারণ হিসাবে বাস্তুর দোষ দেখেন, বাস্তবিদের দ্বারস্থ হন জায়গা বদল করেন, বাড়ী বিক্রি করেন, ফেংশুই রাখেন বা নানান আচার অনুষ্ঠান করেন দোষ কাটাবার জন্য। এটা একটা কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক ভ্রান্ত ধারণা। ঐসব ব্যক্তিদের অধিকাংশই মানসিক রোগের শিকার। মানসিক রোগে রোগী যেমন অন্যলোককে সন্দেহ করে, শত্রু ভাবে তেমনি নিজের বাসস্থানকেও কেউ কেউ সন্দেহ করে। তাই এসব ক্ষেত্রে মানসিক দ্বারস্থ হওয়া প্রয়োজন ।

৪৮। জন্মদাতা মানসিক অসুস্থ হলে ঃ-

মানসিক অসুস্থ থাকা কালীন কোন ব্যক্তি সন্তানের জন্ম দিলে সে সন্তান মানসিক রোগী হবে— এটি ভ্রান্ত ধারণা । মানসিক রোগের কোন প্রভাব শুক্রানুর উপর

পড়ে না। তবে জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর থাকে— তা সুস্থ বা অসুস্থ দুটো অবস্থাতেই । তাই সাধারণের থেকে মানসিক রোগীর বংশধরদের মধ্যে মানসিক রোগে সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে।

৪৯। গর্ভবতী মানসিক অসুস্থ হলে ঃ-

গর্ভবতী মানসিক অসুস্থ হলে সন্তান ও মানসিক রোগী হবে এটি ভ্রান্ত ধারণা। তবে জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর বা ওষুধের Side effect এর প্রবাব বাচ্চার উপর পড়তে পারে — তাও সব ক্ষেত্রে নয়। গর্ভবতী মানসিক অসুস্থ হলে অবশ্যই চিকিৎসা করা প্রয়োজন কারণ চিকিৎসা করালে বাচ্চার যে ক্ষতির ঝুঁকি থাকে না করালে তা আরও বেশি হয়।

মানসিক অসুস্থ মায়ের দুধ খেলে বাচ্চার মানসিক অসুখ হয় না। মায়ের ওষুধ চলাকালীনও বাচ্চার দুধ পান করা উচত। কারণ ওষুধের ক্ষতির থেকে বুকের দুধ না খেলে বাচ্চার বেশি ক্ষতি হয় । এক্ষেত্রে অবশ্য ঔষধ নির্বাচনে চিকিৎসককে সতর্ক থাকতে হয়।

৫০। মানসিক রোগ বংশগত হলেও চিকিৎসায় সারে ঃ-

মানসিক রোগ বংশগত হলেও তা চিকিৎসায় সারে না — এটি ভ্রান্ত ধারণা । অন্যান্য রোগীর মত বংশগত রোগীও চিকিৎসায় সেরে যায় ।